কোনদিন ফিরবো না জেনে

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম ছেলেবেলায়। বাড়িঘর, পশ্চিমের তাল-নারিকেল গাছের বাগান, ইস্কুল, পুকুরভরা জল, ধনদা'-ফনীদা', সুশীলা পিসি,মতি-দিলীপ-নবগোপাল —সবাইকে ছেড়ে এপারে চলে আসতে হয়েছিল দেশভাগ হয়ে যাবার পর। এপার-ওপার বোঝার সময় তখন নয়। আমি তখন ৮ বছরে পা দিয়েছি। দাদা এগোরোয়। একবারে চলে আসা এমন একবারও মনে হয়নি। তিতাস নদী পেরিয়ে শাহবাজপুর গ্রাম। এর পাশেই মলাইশে আমার ছোট পিসির বাড়ি। শাহবাজপুরে নৌকো থেকে নেমে প্রায় দু'মাইল পথ বৈশাখের কড়া রোদে বাবার হাতে ধরে হেঁটে গিয়েছিলাম। মুখ গলা শুকিয়ে কি প্রবল জল তেষ্টা। বাবা বলেছিলেন, এখন জল নয়। এই তো আমরা এসে গেছি। পিসির বাড়ি গিয়ে শরীর ঠাণ্ডা হলে জল খাবে। পিসির বাড়ি গিয়ে সন্ধেবেলা আমার জ্বর এসেছিল। বেশ জ্বর। লহনা নামের একটি মেয়ে, আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়, আমাকে বিছানায় শুইয়ে মাথায় জলের ধারা দিত। আমি ভালো হয়ে যাবার পর লহনা আমার খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। পাশের বাড়ির মেয়ে। ভেবেছিলাম তেমনি কোথাও যাওয়া। ক'দিন বাদে আবার আমরা ফিরে আসব। যেভাবে সবাই একদিন ফিরে আসে। আমার বাবা স্বদেশী আন্দোলন করতেন। এক সময়ে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র তৎপরতায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশের গুলি খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন। পাকিস্তানের জন্ম হবার পর থেকেই পুলিশের সন্দেহের নজর ছিল তাঁর ওপর। আমাদের বাড়ির নাম 'কর্মমঠ'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর আদলেই এই নাম দেওয়া হয়েছিল। কুমিল্লা জেলার সে অঞ্চলের স্বদেশী সংগঠকদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের গোপন দপ্তর ছিল কর্মমঠে। পাকিস্তান হবার পর সাংগঠনিক কাজকর্ম যেটুকুই হত, খুব গোপনে হত। এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও বাড়ছিল। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসের এক শীতার্ত মধ্যরাতে কর্মমঠ ঘেরাও করল পুলিশ। বাড়ির চারদিকে ভারী জুতোর শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সবার। বাইরে থেকে কেউ একজন গলা চড়িয়ে বলছিল, সশস্ত্র পুলিশ গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। কেউ ঘর ছেড়ে বেরোবার চেষ্টা করবেন না। আমরা ঘরে সার্চ করবো। বাবা জবাবে চেঁচিয়ে বললেন, রাত ভোর হলে সূর্যোদয়ের পরই আপনারা ঘরে ঢুকতে পারেন। এই মাঝরাতে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর হানা দিলে আপনাদের বিরুদ্ধে আমি আইনি ব্যবস্থার পথে যেতে বাধ্য হব। পুলিশ অফিসারের সুর একটু নরম হ'ল মনে হয়। বললেন, আমরা রাজি। ভোর অবধি আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। তারপর সকাল হতেই বাড়িময় লণ্ডভণ্ড শুরু হ'ল। ঘরের ভেতর ইট তুলে ফেলে বিশাল গর্ত হ'ল। একই রকম গর্ত হল উঠোনে,বারান্দায়, বাড়ির সামনে ফুলের বাগানে। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস্, বাকসো ভেঙে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলা হল। বইপত্রের সেলফ্, আলমারি, জলের ঘট, হাঁড়ি-কলসি কিছুই বাদ থাকলো না। লেপতোষক, বালিশ-কোলবালিশ ছিঁড়ে চারদিকে তুলোময়। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হ'ল সব ঘর। আপত্তিকর

কিছুই খুঁজে পেল না তারা। পুলিশের কাছে খবর ছিল এ বাড়িতে লুকোনো অস্ত্র আছে। খালি হাতে ফিরে যেতে হ'ল পুলিশের লোকজনদের। যাবার সময় বলে গেলেন অফিসার, আবার আমরা আসবো যে কোনোদিন।

১৯৪৮-এর জানুয়ারি মাস। মাঘ মাসের প্রবল শীত। রাতে বাবার সঙ্গে শুয়েছিলাম। তখন শেষ রাত। তারিখ মনে আছে ৩০ জানুয়ারি। হুড়মুড় করে গায়ের লেপ ঠেলে ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলেন বাবা। লণ্ঠনের প্রায় স্তিমিত আলো উস্কে দিলেন। দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন সামনের বাগানে। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমি উঠে বসলাম, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি প্রথমে। খোলা দরজা দিয়ে প্রবল শীত হাওয়া ঘরে ঢুকছিল। নিশুতি রাত। আমাদের বাড়ির পশ্চিমে রাজমঙ্গলপুরের দিকে একজন লোক চিৎকার করে কিছু বলছিল। ঘরে লেপ মুড়ে শুয়ে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আওয়াজ যেন ক্রমশ আমাদের বাড়ির দিকেই আসছিল। বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকছিলেন, ভলান্টিয়ার, ও ভলান্টিয়ার—। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন লোকটা। এই শীতে খাকি হাফ প্যান্ট পরা। গায়ে ভারী খদ্দরের চাদর। মাথায় সাদা গান্ধী টুপি। পায়ে কাপড়ের জুতো। বললেন, আজই প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়ার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে গান্ধীজী। বাবা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মীর মুখের দিকে। নির্বাক তাকিয়েছিলেন দু'জন দুজনের দিকে। বাবা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনারা কখন খবর পেয়েছেন। মুগরায় খবর এসেছে সন্ধ্যারাতেই। উঠে চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। বাবা বললেন, এক কাপ চা খেয়ে যান। আমার হাতে একদম সময় নেই, বললেন তিনি। বললেন, রায়ের মুড়া, টন্‌কি, মাঝিগচ্ছে প্রচার সেরে সকাল সকাল মুগরায় ফিরে যেতে হবে। গ্রামের মানুষ কখনো মাইক দেখেনি। মাইকের প্রচলন তখন ছিল হয়ত শুধু শহুরে এলাকায়। আমরা গ্রামে থাকলেও গান্ধীজীর আন্দোলনের কথা অনেকেই জানতো। আলোচনা করতো। একটা লম্বা টিনের চোঙ-এ মুখ ঠেকিয়ে প্রচার করছিলেন ভদ্রলোক।

গান্ধীজীর মৃত্যুর খবরে সে রাত্রে বাবাকে খুব উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ মনে হয়েছিল। গায়ে চাদর জড়িয়ে শেষ রাতে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন বেশ বেলা হয়ে যাবার পর। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকেলের দিকে কুমিল্লা থেকে গোপন সূত্রে খবর এলো, বাবাকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্মের অভিযোগ। কসবা থানার পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে যেতে রাতেই বাড়িতে হানা দিতে পারে। ঘনিষ্ঠ তিন চারজন আত্মীয়-সুহৃদের সঙ্গে কথা বললেন বাবা। এঁরা সবাই বললেন, গ্রেপ্তার এড়াতে হলে সে রাতেই ভারতে চলে যাওয়া। বাবা মোটেই রাজি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন, আমার দু'ভাই, মাকে ভারতে পাঠিয়ে সে রাতেই তিনি আত্মগোপনে চলে যাবেন। পূর্ব বাংলার গ্রামেগঞ্জে দীর্ঘদিন সমানে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন করেছেন। দেশের অশিক্ষিত অংশের মানুষের কাছে শিক্ষা ও দেশপ্রেমের আলো পৌঁছে দিতে পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে ৩৬টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে স্বদেশে তৈরি কাপড়ের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য আমাদের বাড়ির মধ্যে হস্ত তাঁতজাত কাপড় তৈরির লম্বা তাঁতঘর করা হয়েছিল। সেখানে ৬০টির মত হস্ত তাঁত একসঙ্গে কাজ করতো। বাবা

বোঝাতে চেয়েছিলেন, গ্রাম-পূর্ববাংলায় তাঁর বিরাট পরিচিতি রয়েছে। বন্ধু, অনুগামী, শুভার্থী, স্বজনের, বিশ্বস্ত মানুষের কোন অভাব নেই। আত্মগোপন করে থাকাটা তাঁর কাছে কোন সমস্যাই নয়। ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে কতবার এমন লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। মা কোন যুক্তিতেই রাজি হলেন না। কেবল অঝোরে কাঁদলেন আর বললেন, তোমাকে এভাবে এখানে রেখে আমরা কিছুতেই ভারতে যাবো না। শুভানুধ্যায়ীরাও মা'র পক্ষ নিলেন। বললেন, এটা কোনভাবেই হয় না। দু'টি শিশু সন্তান নিয়ে একজন মহিলাকে অভিভাবকহীন একটা নতুন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় না। বাবার প্রস্তাবে রাজি হলেন না কেউ। মাত্র দু'ঘণ্টার প্রস্তুতি। বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান, দেশ সবই ছেড়ে আসতে হ'ল সে রাত্রে। মাঘ মাসের শেষ হলেও শীতের আধিপত্য কম ছিল না। বাবার পকেটে নগদ ৪০ টাকার মতো ছিল। বাবার হাতে বড় একটা 'আশীর্বাদ' লেখা সেকেলে টিনের সুটকেস, দাদার মাথায় বিছানার চাদরে বাঁধা জরুরী কাপড়, লটবহর ইত্যাদি, মায়ের হাতে একটা বেতের তৈরি ঝুড়ি। কেবল আমার হাত খালি, সবার ছোট বলে। ছনের ক্ষেত, ঝোপ জঙ্গল ঠেলে বাড়ির পুব দিকে আমিনমুড়ায় বিলের ঘাটে পৌঁছুতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান হলেও সীমান্তের বিলে নৌকো চলাচলের ওপর তখনো কড়াকড়ি বিধিনিষেধ আরোপ হয়নি। আগে থেকে খবর পাঠিয়ে ঘাটে নৌকো ঠিক রাখা হয়েছিল। খাগুটিয়ার ঘাট পেরিয়ে ভারতের সীমান্ত গ্রাম মাধবপুরে আমরা যখন পৌঁছুই ততক্ষণে রাত ১০টা বেজে গিয়েছিল। নৌকা থেকে নেমে বাবা বলেছিলেন, আশঙ্কার কিছু নেই আর। আমরা ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছি।

মাধবপুরে রেবতী সরকার নামে এক কৃষকের বাড়িতে এক মাটির ঘরে আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। মাধবপুরে আমরা প্রায় ৭ মাস থেকেছি। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পরিবার বলে গ্রামের মানুষ খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতো। আমাদের জন্য বস্তাভর্তি ক্ষেতের চাল, আনাজ তরকারি, শাকসব্জি, আম-কাঁঠাল, দুধ-দই, নাড়ু-চিড়ে-মুড়ি-খই, গাছের কলা, নারকেল—কোন কিছুর অভাব রাখেনি গ্রামের মানুষ। এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে বাবার অনেকদিনের পরিচিতি। খুব সকালের দিকে গ্রামের মানুষ কাছের বিলে মাছ ধরতে যেতো। একটু বেলায় আমাদের ঘরে এনে মাছ দিয়ে যেতো। কর্তা ঠাকুরের ঘরে মাছ দিয়ে যাওয়া, এটাই যেন নিয়ম। বেশীর ভাগ দিনে ছোট, কুচো মাছ। পরিমাণেও প্রচুর। মা বলতেন, এতো মাছ আমি একা হাতে কখন কাটবো, রান্না হবে কখন। আশেপাশের বাড়ির মেয়ে বৌ-রা নিজে থেকেই এগিয়ে আসতো। নিজেরা মাছ কেটেকুটে, ধুয়ে দিয়ে মাকে হাতে হাতে সাহায্য করতো। মাধবপুরের দিনগুলি ভালো কেটেছিল। গ্রামে কোন ইস্কুল ছিল না। পড়াশুনোর বালাই নেই। বাবা প্রায়ই আগরতলায় চলে আসতেন। নানা কাজে। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো। কতরকম পাখি। তাদের পারিবারিক কোলাহলের কোন শেষ নেই। যেন বৃষ্টির জলে ধোওয়া গাঢ় সবুজ অফুরন্ত আকাশের দিকে হাত মেলে আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ধরনের পোকা, ঠিক ঝি ঝি পোকা নয়, আম-কাঠালের গাছে গাছে চড়া শব্দ করে এক রকমের কর্কশ গান করে। একটা গাছে এই গান শুরু হলেই পাশাপাশি অন্য গাছগুলিতে একই জাতের পোকারা গলামিলিয়ে গান ধরে। গোটা বনভূমি জুড়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে কানে তালা লাগানোর মত 'গম্‌গম্‌গম্‌' শব্দ।

কেমন নেশা ধরিয়ে দেবার মত একটানা শব্দ। দুপুর গড়াবার আগেই বিলের ঘাটে গিয়ে বসে থাকতাম। বিলে থৈথৈ জল। অজস্র শাপলা ফুল ফুটে আছে কাছাকাছি, দূরেও। গাঢ় গোলাপি রঙের শাপলা ফুল দূর থেকেই নজর কেড়ে নেয়। সাদা ফুলের আফুরান আধিপত্য। কতরকম নৌকো বিলের ঘাটে এসে ভিরছে। আবার চলেও যাচ্ছে। তখনো গ্রামের সীমান্তে 'পাসপোর্ট-ভিসা'র নিয়মকানুন চালু হয়নি। মাধবপুরে এসবের কথা শুনিনি কারো কাছে। বিলের ওপারে ঘন সবুজে ঘেরা গ্রাম। সরল রেখায় চলে গেছে অনেক দূর। উত্তর থেকে দক্ষিণে। দৌলতপুর, কুশামারা, খাগুটিয়া, মিনারকোট, সুলতানপুর—এমনি আরো কত গ্রাম। এসবই নাকি পাকিস্তান হয়ে গেছে। বিলের ঘাটে বসে দেখতাম লাল শাড়ি পরা বৌ সদ্য বিয়ে হয়ে নৌকোয় করে কেঁদে কেঁদে ওপারে চলে যাচ্ছে। বাজনা বেজে চলেছে সাদা পাল তোলা বড় নৌকোয়। মা মাসি, মহিলা আত্মীয় স্বজনরা ভীড় করে আছেন বিলের ঘাটে। অঝোরে কেঁদে চলেছেন তাঁদের কেউ কেউ। বাকি সবাই বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে আছেন নব বধূর যাত্রাপথের দিকে। নৌকো ক্রমশ দূরে চলে গেলেও বাজনার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগে মৃদু হতে হতেও হাওয়ায় ভেসে আসছিল জলের ওপর দিয়ে। মাধবপুর ছেড়ে আমরা আগরতলায় চলে এসেছিলাম সেবছরই সেপ্টেম্বর মাসে। এক ভাড়া করা বাড়িতে আমাদের ঠাঁই হয়েছিল। বাড়ি বলতে দুখানা মাত্র বাঁশ-বেতের ঘর। রান্নার ও থাকার ঘর। জলের সুবিধে ছিল না। খানিকটা দূর থেকে কল্‌সী করে জল আনতে হত। খুব কষ্টেই সংসার চলছিল। বাবার কোন উপার্জনের ব্যবস্থা হচ্ছিল না। ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রম মাণিক্য তখন প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৪৯ ইংরেজীতে এক সময়ের স্বাধীন ত্রিপুরা ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেয়। তখন চলছিল চিফ কমিশনারের শাসন। পূর্ববাংলা থেকে দলে দলে ছিন্নমূল বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ত্রিপুরায় এসে ঢুকছিল আশ্রয়ের জন্য। শিশু হলেও একথা বুঝতে শিখেছিলাম, আমরা বাড়িঘর, দেশ ছেড়ে আসা ছিন্নমূল। রিফিউজি। রিফিউজি হয়ে থাকাটা অপমানজনক মনে হত না যখন দেখতাম আমাদেরই মতো আরো শত শত পরিবার দেশবাড়ি ছেড়ে এপারে চলে এসেছেন চিরদিনের মত। এ সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করবে এমন সংখ্যায় স্কুল তখন ছিল না রাজ আমলের ছোট শহর আগরতলায়। অভিভাবকরা মিলে উদ্যোগ নিলেন। চারটে বেসরকারী স্কুল হল শহরে। আমাদের বাসার কাছেই প্রাইভেট হাইস্কুল হল। গরীবের ইস্কুল। ছনের পাতায় ছাওয়া, বাঁশের খুঁটি, দরমার বেড়া দিয়ে তৈরি ঘর। দরজা-জানালায় কোন পাল্লা বা কপাটের ব্যবস্থা নেই। আমি ক্লাশ ফাইভে এসে ভর্তি হলাম। দাদা এইটে। মাস্টারমশায়রা বেশ যত্ন করে পড়াতেন। পারিশ্রমিক পেতেন নামমাত্র। এই ইস্কুলে আমি তখন ক্লাশ এইটের ছাত্র। কলকাতা থেকে এসে আমাদের ক্লাশে নতুন ভর্তি হ'ল উদয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। চটপটে, বেশ সপ্রতিভ। হড়হড় করে কলকাতার ভাষায় কথা বলত। 'আইছে, কেরে, কইতাম না, তোমরার লাইগ্যা আনব কইছে'—। আমরা বাঙাল ছেলেরা এভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত। উদয়শঙ্করের মুখে কলকাতার কথা শুনে আমরা তো মুগ্ধ। উদয়শঙ্করই আমার পদ্য লেখার প্রথম প্রেরণা। আসলে খুব দুঃখী ছিল ছেলেটা। বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে খুব কম বয়েসে। আগরতলায় ভট্টপুকুরে এক কাকার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এর

আগে কলকাতায় এক মামার সংসারে থেকে এসেছে কয়েক বছর। পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল। পুরোনো বই সংগ্রহ করে দিয়ে আমরা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। ভালো তবলা বাজাতে পারতো। নতুন নতুন কবিতা লিখে আনতো খাতায়। আমায় পড়ে শোনাত। ওর কবিতা শুনে শুনে আমারও কবিতা লেখার আগ্রহ বেড়ে গেল। আমিও লিখে এনে তাকে শোনাতাম। পদ্যের ভুবনে অবুঝ, অপটু পদচারণায় সেই থেকে শুরু। হিসেব করলে ১৯৫৫ ইংরেজী হবে হয়ত। ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় উদয়শঙ্কর ভট্টপুকুরে তার থাকার ঘরেই গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল। ও থেমে গিয়েছিল চিরদিনের মত।

কবিতা লেখায় আগাগোড়াই উৎসাহ পেয়েছি আমার মায়ের কাছে। ১৯৫৪ ইংরেজীতে ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'জাগরণ' বেরুল আগরতলায়। খবরের কাগজ হলেও এই পত্রিকা নিয়মিত কবিতা ছাপাতো। 'জাগরণ'-এ কবিতা পাঠাবার আগে মা-কে দেখিয়ে নিতাম। শব্দ, বানান কিছু ভুল থাকলে মা ঠিক করে দিতেন। পত্রিকায় যে লেখাই পাঠাতাম, একদিন, বেশি হলে দু'দিনের মধ্যে তা ছাপা হয়ে বেরোতো। তখন আমি ক্লাশ নাইনের ছাত্র। কবিতার কিছুই বুঝি না। আমার লেখা নিয়ে পত্রিকার আগ্রহই আমার কাল হল। কেউই আমায় বুঝিয়ে বলেনি, কবিতা লেখা বালকের খেলা নয়। এর জন্য লেখাপড়া করতে হয়। চর্চা ও সময় চেতনা জরুরী ব্যাপার। অচিরেই দৈনিক খবরের কাগজে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাগজে ছাপানো বালখিল্য শব্দমালা পুরোপুরি অস্বীকার করতে গিয়ে খুবই অস্বস্তি হয়েছিল। কবিতার সঙ্গে প্রায় ছয় দশকের প্রাণের বন্ধন। এই ষাট বছরে ক্রমাগত নিজেকে ভেঙেছি-গড়েছি, আবার ভেঙেছি আবার নির্মাণ করেছি। তৈরী হওয়া জিনিস নিয়ে কখনো সন্তুষ্টি ছিল না, এখনো নেই। কবিতা সভায় কেউ ডেকে নিয়ে গেলে যাই ঠিকই, কিন্তু কবিতা পড়ে আমার মন ভরে না। নিজেকে কেবলই নিশ্চল, যান্ত্রিক মনে হয়। নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত ভাঙাগড়ার নেশা, এটা চলছে যথারীতি। কেন লেখেন, প্রশ্নটি অবান্তর মনে হয়। ভালো লাগে, এজন্যই একদা লেখা শুরু হয়েছিল, এখনো তাই। যেমন বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। যেমন আকাশে সারারাত নক্ষত্ররা জেগে থাকতে ভালোবাসে। অজ্ঞাত ভালোবাসায় গাছ ফোটায় নীলকণ্ঠ, অপরাজিতা। দেশভাগ নিয়ে এতো কথা লেখা হ'ল শুধু শিকড়ের টানে। আমাদের পাঁজরের ভেতরে লেগে আছে দেশভাগের দাগ। আমার সমস্ত লেখালেখিতে বারবার এ প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। জ্যৈষ্ঠের দুপুরে তন্দ্রায় শুয়ে থেকে এ বয়েসেও কখনো যেন রাজমঙ্গলপুরের দিক থেকে অস্পষ্ট এক মায়ের গলা শুনতে পাই—'কিরণি, ...কিরণি লো ঘরে আয়'।